জননেতা কমরেড মণি সিংহ

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তির নায়ক

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯০১-১৯৯০

কমরেড মণি সিংহ মেলা উদযাপন কমিটি

সুসং-দূর্গাপুর, নেত্রকোণা

মণি সিংহ'র জীবনী লেখা এত ছোট পরিসরে দুঃসাধ্য কাজ, তারপরও নতুন প্রজন্ম'কে জানাবার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করা হল। এ সংক্ষিপ্ত জীবনীর তথ্যসমূহ সাপ্তাহিক একতা, বজলুর রহমান লিখিত শেখ মুজিব ও মণি সিংহের ঐতিহাসিক বৈঠক (সংবাদ ২৮শে জুলাই, ২০০১), সত্যেন সেন রচিত জননেতা মণি সিংহ (জানুয়ারি ১৯৬৯) ও কমরেড মণি সিংহ লিখিত জীবন-সংগ্রাম বই থেকে সংকলিত।

ঢাকা ২৬শে ডিসেম্বর, ২০০২

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তি পুরুষ মণি সিংহ ১৯০১ সালের ২৮শে জুলাই কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আড়াই বছর বয়সে তাঁর পিতা কালি কুমার সিংহ'র মৃত্যু হলে পরিবার সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। তাঁরা কিছুদিন ঢাকায় তাঁর মামা ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন সিংহের বাড়িতে থাকেন।

মণি সিংহ'র জননী সরলা দেবী ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার সুসং-দুর্গাপুরের জমিদারদের বড় তরফের বোন। মণি সিংহের সাত বছর বয়সের সময় তাঁর বিধবা মাতা সে-সুত্রে জমিদারদের কাছ থেকে বসতবাটিসহ কিছু ভূসম্পত্তি, সাংবাৎসরিক খোরাকী ও শরিক হিসাবে মাসোহারা পেয়ে সুসং-দূর্গাপুরে বাস করতে থাকেন। এখানে স্কুল শিক্ষা লাভের সময় তিনি "অনুশীলন" দলের সাথে পরিচিত হন। "অনুশীলন" দল সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতিতে বৃটিশ রাজ উচেছদ সম্ভব বলে মনে করতো। মণি সিংহ ১৯১৪ সালে "অনুশীলন" দলে যোগ দিয়ে ক্রমশঃ তৎকালীন বাংলার বিপ্লবী কর্মকান্ডে নিজের স্থান করে নেন।
"দুই শত বছরের বৈদেশিক শাসনের জিঞ্জির থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনের আমলে যে বিপ্লবী যুবকেরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সামনের সারিতে এসে যোগ দিয়েছিলেন কমরেড মণি সিংহ তাঁদের অন্যতম।"

১৯২১ সালে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের বিপুল গণজাগরণ তরুন মণি সিংহের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয়। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামে কৃষকদের টেনে আনার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ জেলার কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

১৯২৫ সালে রুশ বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রখ্যাত বিপ্লবী গোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে সুসঙে আলোচনার পর মণি সিংহ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন এবং কলকাতার গিয়ে অনুশীলন দলের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে সম্পর্ক ছেদ করেন।

এ প্রসঙ্গে কমরেড মণি সিংহ তাঁর জীবন সংগ্রাম বই'এ লিখেছেন ঃ
"সুসং-দুর্গাপুরে সুরেশ চন্দ্র দে নামে এক পোষ্টমাস্টার ছিলেন। তিনি ছিলেন অনুশীলন পার্টির উচ্চ কমিটির সদস্য। তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি ছিলেন যুবক, স্বাস্থ্য খুব ভাল, গ্রাজুয়েট, কট্টর এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ। তাঁর বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার রাম গোপালপুরে। তাঁর সাথে পার্টিগত ভাবেই আমাদেরও পরিচয় হয়ে যায়। তিনি সুসং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বদলি হয়ে ময়মনসিংহ শহরে চলে যান। পরে ময়মনসিংহ হতে লোক মারফত একটি চিঠি পাঠান এই মর্মে যে, একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে পাঠাচিছ তাঁকে গোপনে রাখবেন এবং তাঁর সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করবেন। আমরা ঠিক করলাম সুসং-দুর্গাপুর থেকে ছয় মাইল দুরে নাগেরগাতি গ্রামে তাঁকে রাখতে হবে। সেটা আমার কাকীমার বাপের বাড়ি। সেখানে থাকলে জানাজানি হবে না। সে বাড়িতে আমার চাচাত ভাই শচী সিংহও থাকতেন। কথিত ভদ্রলোক এসে উপস্থিত

হ'লেন। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা, গায়ের রং ফরসা, বয়স আমাদের চাইতে কিছু বেশী। নাগেরগাতিতে সকলের সঙ্গে আলোচনা করার সুবিধা হবে না বিবেচনা করে আমরা তাঁকে পাহাড় অঞ্চলে জগৎকুড়া গ্রামে নিয়ে গেলাম। এক পাহাড়ে টিলার উপর আমাদের একটি ঘর ছেড়ে দেয়া হ'ল। টিলাটি বেশ উচু। পানি আনতে হ'ত টিলার নিচ হতে।

এখানে আলোচনার জন্য আমারা উপস্থিত ছিলাম চারজন-প্রভাত চক্রবর্তী, উপেন সান্যাল, মণি সিংহ ও শচী সিংহ। যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর নাম গোপেন চক্রবর্তী। তিনি এখানে আসার কয়েক মাস আগে মস্কো থেকে ফিরে এসেছিলেন। আমাদের সাক্ষাতের সময়টা ছিল ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাস। গোপেন চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে কি করছো?" আমরা বললাম,"আমরা স্কুল করেছি, হাজংদের জন্য পুরোহিতের ব্যবস্থা করেছি এবং এদের ইচ্ছানুযায়ী এদের হাতে আমরা পানি খাচ্ছি। এদের পক্ষে আনার চেষ্টা করছি। কারণ বৃটিশদের তাড়াতে হলে বহু লোক দরকার। এরা সাহসী, সৎ এবং দুর্ধর্ষও বটে। তাছাড়া এদের মধ্যে আমাদের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। এদের আমরা সঙ্গে পাব।" এই কথা শুনে গোপেন চক্রবর্তী বললেন, "তোমরা ভস্মে ঘি ঢালছ।" আমরা এতে খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। আমাদের এসব কাজের স্বীকৃতি নাই-ই, একেবারে তুচছ করে দিচেছ। তিনি বললেন, "এরূপ আন্দোলন করে বৃটিশকে উচ্ছেদ করা যাবে না। দেশে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নবর্ণ আছে। তোমরা হাজংদের হাতে পানি খাচ্ছ, কিন্তু মেথরদের হাতে পানি খেলে সব হাজং তোমাদের ছেড়ে চলে যাবে। এই সংস্কারমূলক আন্দোলন দিয়ে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। মুসলমানদের তোমরা কিভাবে সংগঠিত করবে? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে হলে ভারতের সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা কায়েম করে শোষণমুক্ত সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নচেৎ শোষক ও শোষিতের সমস্যার সমাধান হবে না। সর্বহারা শ্রমিকরাই হল সবচেয়ে বিপ্লবী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের হারাবার কিছু নেই। এদেশে প্রথমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচেছদ করতে হবে সত্য, কিন্তু সাথে সাথে সামন্ততান্ত্রিক প্রথারও উচ্ছেদ প্রয়োজন। দেশের গরীব জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আন্দোলন করে তাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে হবে। কেন আমাদের দুর্দশা; কেন আমরা বঞ্চিত শোষিত তা জনগণকে বোঝাতে হবে। সামাজিক সংস্কার দিয়ে রাজনৈতিক সাফল্য আনা যায় না।"

তিনি শ্রেনী সংগ্রামের ওপর বিশেষ জোর দিলেন। গলা ফাটিয়ে তর্কবিতর্ক হল। এমন আওয়াজ হল যে বাড়ির বয়স্করা ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়ত করতে লাগলেন। তাঁরা ভাবছিলেন ঝগড়া বাধল নাকি ! আমি যুবক, আমার গলা ছিল সবচেয়ে চড়া। আমাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল স্বল্প। আমরা অবশ্য তখন রাশিয়ার বিপ্লবের কথা শুনেছি এবং এটাও শুনেছি যে সেখানে কুলিমজুররা ক্ষমতা দখল করেছে, বড়লোক সব খতম। জার বা সম্রাট খতম। কিন্তু সে বিপ্লব সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। সে সময় দেশে রাশিয়ার বিপক্ষে, লেনিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারই হত বেশি। বলা হ'ত কুলিমজুরের রাজত্ব আর ক'দিন থাকবে। কিছু দিনের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। আমরা অবশ্য ভ্যানগার্ড প্রভৃতি পত্রিকা কখনও কখনও পেয়েছি। তবে তা' থেকে মূল মর্ম ও পথ

উদ্ধার করতে পারিনি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাই ছিল আমাদের সম্বল। কিভাবে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করতে হবে সে ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অস্পষ্ট।

এই অবস্থায় তর্কবিতর্ক কয়েকদিন হল বটে, কিন্তু গোপেনদা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করে এনেছিলেন তা-ই ছিল আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ শ্রেনী সংগ্রামের রাজনীতির কথা ইতিপূর্বে আমরা কখনও শুনিনি। আমরা গোপেনদা'র যুক্তি মেনে নিলাম। প্রভাত চক্রবর্তী তখন কিছু বলেননি। আমাদের মনে হল তিনিও ওটা মেনে নিয়েছেন। অবশ্য পরে আন্দামান বন্দীশালায় তিনি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে কথা হয় শ্রমিকরাই সবচেয়ে বিপ্লবী; কাজেই তাদের মধ্যে প্রথমে কাজ আরম্ভ করতে হবে, পরে কৃষকদের মধ্যে। আমি বললাম,"আমি কলকাতায় গিয়ে কাজের একটা ব্যবস্থা করে অন্যদের সেখানে নিয়ে যাব। কারণ, কলকাতায় আমি দীর্ঘ দশ বছর ছিলাম। কলকাতা আমার জানা জায়গা। আমার আত্মীয় স্বজন আছেন, কাজেই কলকাতায় আমার থাকার কোন অসুবিধা নেই। এই সব কথার পর ঐ জায়গার কাজ প্রায় গুটিয়ে আমি কলকাতায় চলে এলাম।" এভাবে মণি সিংহ কলকাতার মেটিয়াবুরুজে শ্রমিক রাজনীতি শুরু করেন। ১৯২৮ সালের মেটিয়াবুরুজে কেশোরাম কটন মিলে শ্রমিকদের ১৩ দিনব্যাপী ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি দাবি আদায় করতে সক্ষম হন।

১৯৩০ সালের ৯ মে মণি সিংহ কলকাতায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পেলেও নিজ গ্রাম সুসঙে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। এ সময়ে ঐ এলাকায় টংক প্রথার অত্যাচারে নিপীড়িত কয়েকজন কৃষক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সে সময় জমিদারের অধীনস্থ এক মজুরের পক্ষাবলম্বন করায় আপন মাতুল বংশের জমিদারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়। একই সময় পাট চাষীদের এক সভায় মণি সিংহ কৃষকদের পক্ষ নিয়ে পাটের ন্যায্য মূল্য দাবি করে ভাষণ দিলে তাঁর দেড় বছর কারাদন্ড হয়। দেড় বছর পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় নদীয়া জেলার এক গ্রামে অন্তরীণা- বদ্ধ হন। অন্তরীণাবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৩৭ সালে তিনি মাকে দেখার জন্য সুসঙে আসেন।

মণি সিংহ জীবন-সংগ্রাম বই'এ পার্টির সদস্যপদ প্রাপ্তি বিষয়ে লিখেছেন,"১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দীক্ষা নিয়ে ১৯২৮ সাল থেকে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যাই। তখন পার্টিতে সভ্যপদ খুবই সংকীর্ণ ভিত্তিতে দেয়া হত। কাজেই আমি শ্রমিক আন্দোলনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করলেও পার্টির সভ্যপদ তখনও পাইনি। তবে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ আমাকে ওয়ার্কার্স এন্ড পিজেন্টস পার্টিতে নিয়ে নেন ১৯২৮ সালে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কথা তিনি ঘূনাক্ষরেও বলেননি। জেল থেকে বের হয়ে এলে আমি পার্টির সভ্য বলে আমাকে জানানো হয়। তখন ১৯৩৭ সাল।"

মণি সিংহের নিজ এলাকার দশাল গ্রামের মুসলমান কৃষকরা টংক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মণি সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কৃষকদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলে মণি সিংহের আপন মাতুলদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়। ফলে এখানে তিনি জীবনের একটি জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুখোমুখী হন। কিন্তু রক্ত ও সম্পত্তির সম্পর্ক অপেক্ষা মণি

সিংহের কাছে জীবনাদর্শ ও কর্তব্যবোধই বড়ো হলো। তিনি টংক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনে এগিয়ে যান।

কমরেড মণি সিংহ এ প্রসঙ্গে জীবন-সংগ্রাম বই'এ লিখেছেন ঃ

"আমি ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি করিমপুর থানা, নদীয়ার জেল থেকে মুক্তি পাই। আমি মুক্তি পেয়ে কলকাতায় গেলাম, কিন্তু বন্ধু কমিউনিস্টদের কারও দেখা পেলাম না। ঐ সময়ে কলকাতা ছাড়া আর কোথাও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। সেই কমিউনিস্ট পার্টিও ছিল আত্মগোপনে। আমার কাছে যে রেলওয়ে পাস ছিল-ঐ পাস নিয়ে ঐ দিনই-আমার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম- মায়ের সাথে দেখা করার জন্য। গ্রামে আসার ২/৩ দিনের মধ্যেই মুসলিম কৃষকরা আমার সাথে দেখা করতে এলেন। ৮/১০ জন বয়স্ক মুসলিম কৃষক আমার বাড়িতে এসে বললেন, "খোদার রহমতে আপনে খালাস পাইছেন-আমরা খুব খুশি হইছি। এহন আপনে টংকটা লইয়া লাগুইন। আমরা আর টংকের জ্বালায় বাঁচতাছি না।" আমি তাঁদের বললাম, "আমি কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলন করি, মাকে দেখার উদ্দেশ্যে সাতদিনের জন্য বাড়ি এসেছি, কাজেই আমি ফিরে যাবো।" তাঁরা বললেন, "এডা হয় না। দেশের ছাওয়াল দেশে থাকিয়া টংক লইয়া লাগুইন। আমরা যাতে বাঁচি তার চেষ্টা করুইন। খোদা আপনার ভালা করব।" আমি তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রতিদিন তাঁরা এসে আমাকে টংক আন্দোলন করার জন্য অনুরোধ করতে থাকলেন।

চার পাঁচদিন পর- একদিন রাত্রিবেলায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলাম যে, আমি কি ট্রেড ইউনিয়ন কাজের জন্য কলকাতা যেতে উদগ্রীব? ঐ সময়ে মেটিয়াবুরুজে একটি ট্রেড ইউনিয়নের বেস (base) সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ আমরা প্রতিটি শ্রমিক সংগ্রামে জয়লাভ করেছিলাম। এখানে টংক আন্দোলন করা জটিল ও কঠিন ব্যাপার। কারণ যাদের বিরুদ্ধে টংক আন্দোলন করতে হবে, তাঁরা সবাই আমার আত্মীয়। কেবল তাই নয়, আমার নিজ পরিবারেরও টংক জমি আছে। কাজেই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। হয়ত এই সব কারণে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। এই কথা যখন আমার মনে উদয় হ'ল, তখন আমার মধ্যে এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'ল। ট্রেড ইউনিয়ন না টংক আন্দোলন?

টংক প্রথা

টংক মানে ধান কড়ারী খাজনা। হোক বা না হোক কড়ার মত ধান দিতে হবে। টংক জমির ওপর কৃষকদের কোন স্বত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কলমাকান্দা, সুসং-দূর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দি থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং-জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। কেন টংক নাম হ'ল তা' জানা যায় না, এটা স্থানীয় নাম। এই প্রথা বিভিন্ন নামে ঐ সময়ের পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, যেমন চুক্তিবর্গা, ফুরন প্রভৃতি। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুসং-জমিদারি এলাকায় যে টংক ব্যবস্থা ছিল তা ছিল খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হ'ত সাত থেকে পনের মন। অথচ ঐ সময়ে জোত জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ঐ সময়ে ধানের দর ছিল প্রতিমন সোয়া দুই

টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হ'ত এগার টাকা থেকে প্রায় সতের টাকা। এই প্রথা শুধু জমিদারদের ছিল তা নয়; মধ্যবিত্ত ও মহাজনরাও টংক প্রথায় লাভবান হতেন। একমাত্র সুসং-জমিদাররাই টংক প্রথার দুই লক্ষ মন ধান আদায় করতেন। এটা ছিল এক জঘন্যতম সামন্ততান্ত্রিক শোষণ।

সুসং-জমিদাররা গারো পাহাড়ের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়ে মনে হয় এই প্রথা প্রবর্তন করেন। জোত স্বত্বের জমির বন্দোবস্ত নিতে হ'লে প্রতি সোয়া একরে এক'শ টাকা থেকে দু'শ টাকা নজরানা দিতে হ'ত। গরীব কৃষক ঐ নজরানার টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ ছিলেন না। টংক প্রথায় কোন নজরানা লাগত না। কাজেই গরীব কৃষকের পক্ষে টংক নেওয়াই ছিল সুবিধাজনক। টংকের হার প্রথমে এত বেশি ছিল না। কৃষকরা যখন টংক জমি নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন, তখন প্রতি বছর ঐ সব জমির হার নিলামে ডাক হ'ত। ফলে হার ক্রমে বেড়ে যায়। যে কৃষক বেশী ধান দিতে কবুল করত তাঁকেই অর্থাৎ পূর্বত বেশি ডাককারী কৃষকের নিকট থেকে জমি ছাড়িয়ে হস্তান্তর করা হ'ত। এই ভাবে নিলাম ডাক বেড়ে গিয়ে ১৯৩৭ সাল থেকে হার সোয়া একরে পনের মন পর্যন্ত উঠে যায়।

আমি ভাবতে লাগলাম আমি যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হই, যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ ক'রে থাকি, তবে সেখানে আমার এবং আমার পরিবারের স্বার্থ নিহিত রয়েছে-প্রয়োজনে ও আদর্শের জন্য তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা আমার কর্তব্য। যা অন্যায়, যা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও উচিত। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চেতনা উদ্দীপিত করা ও তাঁদের সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। এবং এইভাবেই দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর ক'রে নেয়া সম্ভব। এটা আমার আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ নিহিত আছে ব'লে আমি ঐ আন্দোলন হতে কখনোই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আমার স্বার্থ আছে বলেই আমাকে কৃষকদের নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কৃষকদের এই সংগ্রামে সাথী হয়ে যদি এই সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমার সঠিক পথে যাত্রা শুরু হবে। এটা আমার জীবনের মূল পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। এই দ্বন্দ্ব আমার মধ্যে চলতে লাগল; যাঁর সাথে পরামর্শ করতে পারি এমন কোন বন্ধুও তখন ছিল না। আমার মন ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শই ছিল আমার বড় বন্ধু। আমার দুই দাদা ছিলেন ভিন্ন চেতনা ও চিন্তার মানুষ। তাঁদের সাথে পরামর্শ করার প্রশ্নই ছিল না। সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় এমন একজন কেউ ছিল না যার সাথে পরামর্শ করা যেতে পারত।

"আমার যতটুকু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞান ছিল, আর যেটুকু শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাকেই ভিত্তি ক'রে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, টংক আন্দোলনে আমি সর্বতোভাবে শরিক হবো।" এভাবে মণি সিংহ টংক আন্দোলনের সাথে জড়িত হলেন এবং কাল-ক্রমে এ আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত হলেন।

আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে ১৯৪০ সালে সরকার সার্ভে করে টংকের পরিমান কমিয়ে দেয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে গভর্নর টংক এলাকার অবস্থা সচক্ষে দেখতে এলে পূর্বাহ্নে কয়েকজন সহকর্মীসহ মণি সিংহকে গ্রেপ্তার করে ১৫দিন আটক রাখা হয়। ছাড়া পেয়ে পরিস্থিতি বুঝে তিনি আত্মগোপন করেন। ব্রিটিশ সরকার টংক প্রথার সংস্কার করলেও প্রথাটি উচ্ছেদ হলো না। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন কৃষক সভা "টংক" প্রথার পুরোপুরি উচেছদ চাইলো।

১৯৪৪ সালে মণি সিংহ সারা বাংলার কৃষাণ সভার প্রেসিডিয়ামের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষাণ সভার ঐতিহাসিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মণি সিংহ ছিলেন সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক। এ সম্মেলনে নেত্রকোণা শহরের নাগড়ার মাঠে একলক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ, পিসি যোসি সহ ভারত বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের সাধারণ নির্বাচনে তিনি নেত্রকোনা জেলার নিজ এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও টংক আন্দোলন চলতে থাকে এবং সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। সে সময়ে প্রচলিত গল্প ছিল যে, কমরেড মণি সিংহ একটি সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে টংকের পরিবর্তে টাকায় খাজনা প্রবর্তিত হয় এবং জমিতে কৃষকের স্বত্ব স্বীকৃত হয়। মণি সিংহের নেতৃত্বে এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা উচেছদের এই আন্দোলনকে মেয়ে-পুরুষ-শিশুসহ ৬০জন সংগ্রামীকে পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। কৃষকদের শতশত বাড়ি ধুলিসাৎ ও গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা হয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এলাকায় কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী তৃণমূল সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানে প্রথম মুসলিম লীগ সরকার মণি সিংহের বাড়ি ভেঙ্গে ভিটায় হালচাষ করায় এবং তাঁর স্থাবর সম্পত্তি নিলাম করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কমরেড মণি সিংহ 'কে তার বাড়ি-ভিটা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এর উত্তরে কমরেড মণি সিংহ বলেছিলেন, "টংক আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং তাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই দেশের প্রতিটি মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান না হচেছ ততদিন পর্যন্ত আমার বাড়ি-ভিটা ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। যে দিন সবার ব্যবস্থা হবে সেদিন আমারও ব্যবস্থা হবে।"

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সত্যেন সেন লেখেছেন ঃ

"১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পূর্ণ গণতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজের আদর্শকে যাঁরা সামনে এনেছেন মণি সিংহ তাঁদের একজন। বাংলার মেহনতী মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি সংগ্রামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক এই প্রিয় নেতাকে কায়েমী স্বার্থের রক্ষকেরা দমন করার সব রকম চেষ্টাই করেছেন।"

পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত মণি সিংহ বস্তুতঃ একটানা ২০ বছর আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হন। ১৯৪৮ সালে অল্প কয়েকদিন এবং ১৯৫৫ সালে আবু হোসেন সরকারের মুখ্য মন্ত্রিত্বের সময় এক মাস তিনি প্রকাশ্যে থাকতে পেরেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী ছিল এবং আইয়ুব সরকার তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য দশ(১০) হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ এক সম্মেলনের মাধ্যমে তদানীন্তন পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের এক 'বাম হটকারী' নীতি গ্রহণ করেছিল। পরে ঐ ভুল লাইন ত্যাগ করে ১৯৫১ সালে পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মণি সিংহকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক (সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচিত করা হয়। পার্টির আত্মগোপন অবস্থায় ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনে মণি সিংহ পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তৃতীয় সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

পাকিস্তান আমলে বেআইনী অবস্থায় থেকে কমিউনিস্ট পার্টি কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে বাঙ্গালীর স্বাধিকার আন্দোলন ও পাকিস্তানী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সংবাদ সম্পাদক বজলুর রহমানের লেখায়ঃ

"১৯৬১ সালে নভেম্বর মাসের শেষে পাকিস্তানের মার্শল'র বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক সংগঠিত করেছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এবং এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান (তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি) এবং ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কমরেড মণি সিংহ ও খোকা রায়। ঐক্য ও সহযোগিতার প্রশ্নে মোটামুটি মনস্থির করেই উভয়পক্ষের নেতৃবন্দ বৈঠকে এসেছিলেন। তা' সত্ত্বেও চার চারটি দীর্ঘ বৈঠকের প্রয়োজন হয় কর্মসূচী চূড়ান্ত করতে। যে দাবিটির অন্তর্ভূক্তি নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় তা হলো পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার প্রশ্ন। কিন্তু সে কথা পরে। আন্তরিকতার উষ্ণতায় মুহূর্তে ঘুচে গেল অপরিচয়ের ব্যবধান। শেখ সাহেব বললেন স্বভাবসিদ্ধ বিনিময়ের সঙ্গে দাদা আপনারা বহু সংগ্রামের পোড় খাওয়া নেতা। আপনারা পথ নির্দেশ দিন কিভাবে আন্দোলন শুরু করা যায়। সামরিক শাসন দেশটাকে ছারখার করে ফেলল। প্রতিবাদের পথ বন্ধ করে দিয়ে পাঞ্জাবি বিগ বিজনেস লুটে নিয়ে যাচেছ বাংলার সম্পদ। সোনার বাংলা আজ শ্মশান। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। দেশের মানুষও তৈরি। শুধু সহস করে ডাক দেয়ার অপেক্ষা।

মণি সিংহ বললেন, আপনারা যুবক। দেশের ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতে। মানুষ আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। তরুণ সমাজকেই সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তবে বুড়ো বলে বাতিল করে দেবেন না। আমরাও আছি আপনাদের তরুণদের মিছিলে। একটু থেমে পরিহাস তরল কণ্ঠে বললেন, জানেন তো, আমি কিন্তু বুড়োর দলে পড়তে রাজি নই। তা যখনই কেননা চুল পাকুক আর টাক পড়ুক। সবাই হেসে উঠলেন। মণি সিংহ'র ছিল মাথাজোড়া চকচকে টাক। সেদিন বৈঠক

চলেছিল প্রায় দু-আড়াই ঘন্টা। দেশের পরিস্থিতির সামগ্রিক পর্যালোচনা করে উভয় পক্ষ একমত হন, আইয়ূবশাহীর বিরুদ্ধে অবিলম্বে একটা ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। আলোচনা হয় অত্যন্ত খোলামেলা ও সোহার্দ্যপুর্ণ পরিবেশে। উভয়পক্ষের মনে পরস্পরের সদিচছাও আন্তরিকতা সম্পর্কে সৃষ্টি হয় গভীর আস্থা। এ পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থা উত্তরকালে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এবং আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এভাবে মোট পাঁচটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সব বৈঠকের ভেতর দিয়ে আইয়ূব বিরোধী গণআন্দোলনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। **শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসনের অবসান, বন্দিমুক্তি, স্বায়ত্তশাসন, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া প্রভৃতির ভিত্তিতেই আন্দোলনের কর্মসূচী স্থির করা হয়।** এর ভিত্তিতেই ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে সমঝোতা গড়ে উঠে এবং '৬২-র ছাত্র আন্দোলন দানা বেধে ওঠে। শুধু '৬২-র ছাত্র আন্দোলন নয় পরবর্তীকালে ছয় দফা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন, ছাত্রদের এগারদফা কর্মসূচী রচনা ও তার ভিত্তিতে ঐক্যদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ গড়ার কাজে দুই দলের সহযোগিতামূলক নীতি-এসবের পেছনে ওই বৈঠকের প্রভাব কিছু না কিছু ছিল বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।" দীর্ঘ ২০ বছর হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে থাকার পর ১৯৬৭সালে কমরেড মণি সিংহ গ্রেফতার হন। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পার্টির চতুর্থ সম্মেলনে (যা ঘোষিত হয়েছিল পার্টির প্রথম কংগ্রেস হিসেবে) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

"ঐতিহাসিক ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুদয়ের চাপে ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি অন্যান্য রাজবন্দীর সাথে একই দিনে কারাগারের বাইরে প্রকাশ্য জনতার সামনে উপস্থিত হয়ে পূর্ণগণতন্ত্র এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরিক থাকার শপথকে নতুন ভাবে সোচ্চার করে তোলেন।" ঐ বছরই ২৫ মার্চ পুনরায় সামরিক আইন জারী হলে তিনি আবার আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপন অবস্থায় ঐ বছরই জুলাই মাসে আবার তিনি গ্রেপ্তার হন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বন্দীরা রাজশাহী কারাগার ভেঙ্গে তাঁকে মুক্ত করে। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে শরিক হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মণি সিংহ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাজনৈতিক, কুটনৈতিক সমর্থন, সাহায্য সহযোগিতা আদায়ে কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান ছিল অবিসম্বাদিত। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণী আন্তর্জাতিক নেতাদের মধ্যে সর্ব প্রথম এক চিঠিতে পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানান। সেভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তিন তিন বার পাকিস্তান কনফেডারেশন গঠনের মার্কিন প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা রাশিয়ান একে-৪৭

রাইফেল নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে তার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করতে চাইলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তার ৬ষ্ঠ নৌবহর প্রেরণের কথা ঘোষণা করে। এ পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কমরেড মণি সিংহ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সম্মিলিত মুক্তি বাহিনী সংগঠিত করার কাজে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। এর ভেতর দিয়ে পার্টি ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের পাঁচ হাজার কর্মী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মণি সিংহ সপরিবারে দূর্গাপুরে আসেন। এই প্রেক্ষিতে দূর্গাপুর ডিগ্রী কলেজ মাঠে স্মরণাতীত কালের এক বৃহত্তম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় কমরেড মণি সিংহ বলেন,"অত্যাচারী পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠী পার্টির নেতা কর্মীদের উপর জেল জুলুম নির্যাতন চালিয়ে পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ঐ অত্যাচারী শোষক গোষ্ঠী পরাজিত হয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের সমর্থনে বেঁচে আছে এবং মেহনতী মানুষের সংগ্রামের ঝান্ডাকে উচুতে তুলে ধরে দৃপ্ত পদক্ষেপে আগামী দিনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচেছ। তিনি বাংলাদেশ বিশ্বে আর একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আবির্ভুত হবে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।"

স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে এবং ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কংগ্রেসে মণি সিংহ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৭৫সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কমিউনিস্ট পার্টি আবার বেআইনী ঘোষিত হয়। ঐ সময়ে আজীবন সংগ্রামী এ নেতা আবার রাজনৈতিকভাবে নির্যাতিত হন ও কারা বরণ করেন। মণি সিংহ বিভিন্ন কথপোকথনে উল্লেখ করেছিলেন যে ঃ
১৯৭৭ সালে মাঝামাঝি সময় একদিন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কমরেড মণি সিংহ'কে প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ জানান। ঐ বৈঠকে তৃতীয় বিশ্বের দেশে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। তা'ছাড়া প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কমরেড মণি সিংহকে তাঁর আত্মজীবনী লেখার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু পরদিন ভোর রাতে কমরেড মণি সিংহ'কে নিবর্তন মূলক আইনে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে ছয়(৬) মাস অন্ত রীণ রাখা হয়। সেই সময়ে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

ব্যক্তিগত জীবনে কমরেড মণি সিংহ ছিলেন অনারম্বর সাদামাটা জীবনের অনুসারী। কমরেড অণিমা সিংহ ছিলেন কমরেড মণি সিংহের সহধর্মিনী । তরুণ বয়সে সিলেটে মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী থাকা অবস্থায় তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি কৃষক নেত্রী ছিলেন। টংক আন্দোলনের সময় তিনি ঐ আন্দোলনে যোগদান করেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তিনি কমরেড মণি সিংহের সাথে আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। আত্মগোপন থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে ইতিহাসে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৮০সালের ১লা জুলাই মাত্র ৫২ বছর বয়সে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

১৯৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কমরেড মণি সিংহ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তখন থেকে ১৯৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শয্যাশয়ী ছিলেন। ৮৪ বছর বয়স পর্যন্ত সক্রিয় ভাবে তিনি পার্টির দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সত্যেন সেন লিখেছেন ঃ

"মণি সিংহ'র সংগ্রামী জীবনকে আমরা এককভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখি না। মণি সিংহের মধ্যে আসলে জনগণের জীবনী অভিব্যক্তি পেয়েছে। মণি সিংহের সংগ্রামী জীবনের শিক্ষা জনগণের সংগ্রামী জীবনের শিক্ষা । মণি সিংহের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অগণিত নামী ও বেনামী মেহনতি মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ত্যাগ-তিতিক্ষার সংগ্রাম। মণি সিংহের অতীত জীবনকে জানার মধ্য দিয়ে জনসাধারণ নিজেদের অতীত'কে দেখতে পাবেন।"

মণি সিংহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ অব পিপলস-এ ভূষিত

সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতি মন্ডলী (প্রেসিডিয়াম) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহকে *"অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ অব পিপলস"*-এ (জাতিসমূহের বন্ধুত্ব-প্রতীক সম্মান) ভূষিত করেছেন। ২৮শে জুলাই, ১৯৮০ জননেত কমরেড মণি সিংহের ৮০তম জন্ম দিবসে তাঁকে এ সম্মান দেওয়া হয়। ঐ দিন সকাল ১১টায় বাংলাদেশে নিযুক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ই স্তেপানভ পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মণি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর উক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানান। রাষ্ট্রদূত সভাপতিমন্ডলীর নিম্নোক্ত ডিক্রী পড়ে শোনান ঃ

"শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজ-প্রগতির সংগ্রাম এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রী সুদৃঢ়করণে আপনার অবদান ও আপনার আশিতম জন্ম দিবস উপলক্ষে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতিমন্ডলীর ডিক্রী বলে, কমরেড মণি সিংহ, 'আপনাকে অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ অব পিপলস-এ ভূষিত করা হল'।"

মণি সিংহ'র মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টির শোক প্রস্তাবে (একতা, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৯১) যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় তার কিছু অংশ এখানে তুলে দেয়া হল ঃ

"বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের সঙ্গে কমরেড মণি সিংহের নাম ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি সেই প্রজন্মেরই একজন অগ্রণী মানুষ যারা এই দেশে শোষণ থেকে মুক্তির ভাবাদর্শ কমিউনিজমের পতাকা বহন করে এনেছেন। নব্বই বছরের আয়ুষ্কালে সত্তর বছর দেশমাতৃকার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শোষিত-নির্যাতিত মেহনতী মানুষের মুক্তি, শোষণহীন সমাজ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

এবং জনগণের কল্যাণ ও বিশ্বশান্তির সুমহান লক্ষ্যকে জীবনের ধ্রুবতারা করে শত বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে একনিষ্টভাবে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মণি সিংহ এক বিরল ব্যক্তিত্বের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সামগ্রিক সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন মণি সিংহ। তাঁর নামটিই হয়ে উঠেছিল সংগ্রামের প্রতীক। এবং এই প্রতীকই নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করেছিল কমিউনিজমের আদর্শের দিকে। মণি সিংহের জীবনে অভিব্যক্ত হয়েছে একটি ঐতিহাসিক কাল এবং সেই কালের ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটি ও আমাদের সমগ্র পার্টি মণি সিংহের মহান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

শোষন মুক্তির আদর্শ ও বিপ্লবের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, গভীর দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, গরিব-দুঃখী শোষিত-নির্যাতিত মেহনতী মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, সততা সাহস, সবলতা, লড়াকু মনোভাব, কথা ও কাজের সমন্বয় সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব জনগণের মধ্যে শ্রমসাধ্য কাজ, বিপ্লবী শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল মণি সিংহের ব্যক্তিত্বে। শত উত্থান পতনের মধ্যেও তাঁর কঠোর সময়ানুবর্তিতা নিয়মানুবর্তিতা অবিস্মরণীয়। মণি সিংহের ৮০তম জন্ম দিনে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে, "আমাদের পার্টির বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতীক" বলে অভিহিত করেছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি তা পূনর্ব্যক্ত করছে। জীবনব্যাপী বিপ্লবী সাধনার মধ্য দিয়ে মণি সিংহ তাঁর উত্তরপুরুষের সকল দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী ও মানব-প্রেমিকদের জন্য রেখে গেছেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর সাদামাটা জীবন-যাপন সকল সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষের জন্য আদর্শ স্থানীয়। সকল দলমতের মানুষের কাছেই একজন সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতার আসন তিনি লাভ করেছেন। মণি সিংহের জীবন সংগ্রামের মহান শিক্ষা ও স্মৃতি আমাদের পার্টির অগ্রযাত্রায় অক্ষয় প্রেরণার উৎস্য। তাঁর বহন করা আদর্শের রক্ত পতাকা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, সমগ্র পার্টি ও সকল কমরেড সর্বশক্তি, মেধা, শ্রম ও রক্ত দিয়ে চিরসমুন্নত রাখার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে।"

ভাস্বর পুরুষ

শামসুর রাহমান

তুমি কি মিলিয়ে গেলে শূন্যতায় ভাস্বর পুরুষ ?
না, তুমি নিদ্রিত দ্বিপ্রহরে;
যেন যুদ্ধ বিরতির পর কোনো পরিশ্রান্ত সেনানী বিশ্রামে
ভরপুর। তোমার নিদ্রার মসলিন
কিছুতে হবে না ছিন্ন চিলের কান্নায়, প্রতিবাদী
মানুষের যৌথ পদধ্বনিতে অথবা
রক্ত গোলাপের মতো পতাকার জাগর স্বননে
জোয়ারের প্রবল উচ্ছ্বাসে।

তোমার নিস্পন্দ, প্রাজ্ঞা চোখের পাতায়
ঘুমিয়ে রয়েছে আমাদের স্বপ্ন সমুদয় আর
অনেক আকাঙ্ক্ষা স্তব্দ তোমার বাহুতে, শপথের
বাক্যগুলি নিদ্রিত ওষ্ঠের তটে পুনরায় জেগে
উঠবার প্রত্যাশায়। দশদিক থেকে
নম্র পায়ে লোক আসে অর্ঘ্য দিতে আজ
তোমারই উদ্দেশ্যে হে নন্দিত কিংবদন্তি। সকলের
মাঝে ছিলে; কৃষক, মজুর, ছাত্র সবার হৃদয়ে
করেছো রোপন
মানবিক বীজ নিত্য কর্মিষ্ঠ চাষীর মতো। জাগো,
জেগে ওঠো স্বতন্ত্র মানব
পৃথিবীর রৌদ্রে ফের ঝেড়ে ফেলে মৃত্যুর তুষার ।

ভাস্বর পুরুষ, সংগ্রামকে জীবনের সারসত্য
জেনে তুমি নিয়ত হেঁটেছো পথে। যেখানে তোমার পদচ্ছাপ
পড়েছে প্রগাঢ় সেখানেই সাম্যবাদ চোখ মেলাবার
অভিলাষ করেছে প্রকাশ। কী ব্যাপার মমতায়
তাকিয়েছো বার বার ভবিষ্যের দিকে। প্রগতির
প্রসিদ্ধ চার চারণ জাগো, জেগে ওঠো, চেয়ে দ্যাখো,
করোনি শাসন কোনোদিন তবু বাংলাদেশ আজ
তোমাকেই গার্ড অব অনার জানায়।

অণিমা সিংহ

বিশ বছর বয়সে মণি সিংহ

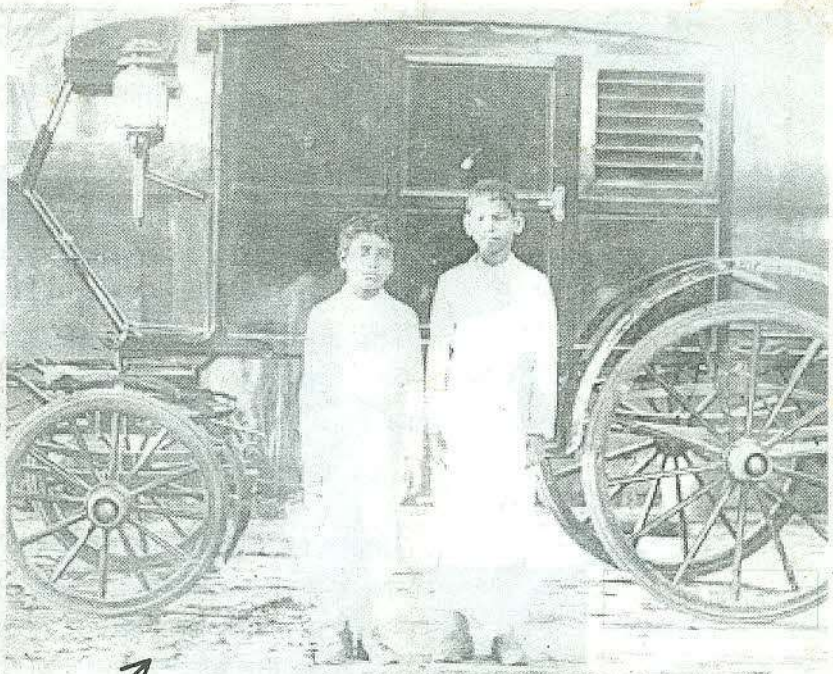

শৈশবে কমরেড মণি সিংহ
ঢাকা, ১৯১১

কমরেড মণি সিংহ
ঢাকা, ১৯৮০